135

দৈনিক জনকণ্ঠ

তারিখ 25 FEB 1996
পৃষ্ঠা ৬ কলাম ৬

প্রসঙ্গ সাক্ষরতা এবং শিক্ষা

এস.এম মোর্শেদ

সাক্ষরতা এবং শিক্ষা দুটো পৃথক ধারণা হলেও একটি অপরটির সাথে সম্পর্কিত। শিক্ষার প্রাথমিক সোপান সাক্ষরতা। তবে এটা ঠিক যে, কালের বিবর্তনে সাক্ষরতার সংজ্ঞা যত দ্রুত পরিবর্তিত হয়েছে, শিক্ষার সংজ্ঞা তেমন বদলায়নি।

১৯৫১ সালে সাক্ষরতার সংজ্ঞা ছিল স্পষ্ট ছাপার অক্ষরে লেখা যে কোন বাক্য পড়তে পারার সক্ষমতাই সাক্ষরতা। মাত্র দশ বছর পর আমরা সাক্ষরতার সংজ্ঞা পেলাম এভাবে– "বুঝে কোন ভাষা পড়তে পারাই সাক্ষরতা"। ১৯৮১ সালে এই সংজ্ঞা নতুন রূপ পরিগ্রহ করল— "যে কোন ভাষায় চিঠি লিখতে পারার সক্ষমতাই সাক্ষরতা"। ১৯৮৯ সালে সাক্ষরতার সংজ্ঞা দাঁড়ায়— "মাতৃভাষার কথা শুনে বুঝতে পারা, মৌখিক ও লিখিতভাবে তা ব্যক্ত করার সাথে সাথে প্রয়োজনীয় দৈনন্দিন হিসাব করা এবং তা লিখে রাখার ক্ষমতাই সাক্ষরতা"। অন্যদিকে শিক্ষা একটি দীর্ঘমেয়াদী প্রক্রিয়া। প্রাতিষ্ঠানিক ও অপ্রাতিষ্ঠানিক দু'ভাবেই শিক্ষার বিকাশ মানবজীবনে অব্যাহত থাকে।

বিশ্বজুড়ে নিরক্ষরতা

সাক্ষরতা শব্দের বিপরীত শব্দ নিরক্ষরতা। সোজা কথায় নিরক্ষরতা মানে অক্ষরজ্ঞানের অভাব। ইউনেস্কোর সূত্রানুযায়ী পৃথিবীর সর্বত্র সাক্ষরতা আন্দোলন জোরদারের ফলে বিগত বছরগুলোতে উল্লেখযোগ্যহারে সাক্ষর জনগোষ্ঠীর সংখ্যা বাড়লেও এখনও বিশ্বের ৮৮৫ মিলিয়ন নারী-পুরুষ নিরক্ষর। তন্মধ্যে ২৯% মহিলা।

নিরক্ষর নারীর আধিক্য

গ্রাম এলাকায় নিরক্ষর মহিলার সংখ্যা বেশি। কোন কোন দেশে পুরুষদের তুলনায় মহিলাদের নিরক্ষরতার হার দ্বিগুণ বা ত্রিগুণ বেশি। হন্ডুরাসে ১৯৮৮ সালে পরিচালিত এক জরিপে দেখা যায় যে, শহর এলাকায় যেখানে মহিলাদের নিরক্ষরতার হার ৯% সেখানে গ্রাম এলাকায় সেই হার ৩১%।

বিশেষত উন্নয়নশীল দেশগুলোতে বয়স্ক মহিলাদের ক্ষেত্রে শিক্ষার প্রতি উদাসীনতার কারণে নিরক্ষর জনগোষ্ঠীর সংখ্যা বেড়েছে। এসব দেশে সাক্ষরতার গড় হার ২৫%। উন্নয়নশীল দেশগুলোতে ৪৫ বছর বয়সের উর্ধে নিরক্ষর মহিলার হার ৫০%। আফ্রিকা এবং এশিয়া মহাদেশের কোন কোন দেশে এ হার ৭০%-এ উন্নীত হয়েছে। বাংলাদেশে ৩৬.১% পুরুষ স্বাক্ষরজ্ঞানসম্পন্ন হলেও মহিলাদের এই হার ২১.৩%।

প্রাথমিক শিক্ষায় নারী

১৯৯০ সালে আফ্রিকাতে প্রাইমারি স্কুলে ছেলে ও মেয়ে শিক্ষার্থীর অনুপাত ১০০:৭৯, এশীয় ও প্রশান্ত মহাসাগরীয় অঞ্চলে এ হার ১০০:৮৪, লাতিন আমেরিকা ও ক্যারেবীয় অঞ্চলে ১০০:৯৫, পশ্চিম ইউরোপে ১০০:৯৫ এবং পূর্ব ইউরোপে ১০০:৯৬। বাংলাদেশে যে ৪২% শিশু প্রাইমারি স্কুলে ভর্তি হয় না তাদের অধিকাংশই মেয়ে শিশু।

উপানুষ্ঠানিক শিক্ষা

প্রাতিষ্ঠানিক শিক্ষা ব্যবস্থায় উল্লেখযোগ্য সংখ্যক শিক্ষার্থীর ঝরে পড়ার (dropout) প্রেক্ষিতে উপানুষ্ঠানিক শিক্ষা অপরিহার্য হয়ে দাঁড়িয়েছে। বর্তমানে বাংলাদেশে প্রাথমিক বিদ্যালয়ের ঝরে পড়া শিক্ষার্থীর হার ৬৫%। এসব বিদ্যালয়ত্যাগী শিক্ষার্থীকে সাক্ষর করে তুলতে এনজিও ইতিবাচক ভূমিকা রাখছে যা ইতোমধ্যে বিশ্বব্যাপী প্রশংসা কুড়িয়েছে। গণউন্নয়ন প্রচেষ্টা, ব্র্যাক, প্রশিকা, ইউনিসেফ, কোডেক প্রভৃতি এনজিও বাংলাদেশে সাক্ষরতা আন্দোলনে নতুন মাত্রা যোগ করেছে।

ব্র্যাক ১৯৮৫ সাল হতে উপানুষ্ঠানিক শিক্ষা কার্যক্রম শুরু করে এ পর্যন্ত ৫২২২টি উপানুষ্ঠানিক স্কুল চালিয়ে আসছে। এ পর্যন্ত ১,৬৮,০০০শিশু ব্র্যাকের স্কুল থেকে উপানুষ্ঠানিক শিক্ষা পেয়েছে। তন্মধ্যে ৭০% মেয়ে গ্রামের ভূমিহীন পরিবার থেকে আগত।

বাংলাদেশে বেসরকারী পর্যায়ে শিক্ষা বিস্তারে কর্মরত সংস্থাসমূহের মধ্যে গণউন্নয়ন প্রচেষ্টা অন্যতম। ১৯৭৪ সালের জানুয়ারি মাস থেকে জিইউপি বয়স্ক শিক্ষা কার্যক্রম চালিয়ে আসছে। ১৯৭৮ সাল থেকে সীমিত পরিসরে শিশু শিক্ষা এবং ১৯৯৪ সাল হতে ব্যাপকভিত্তিতে শিশু শিক্ষা কার্যক্রম যাত্রা শুরু করেছে। বর্তমানে ৫টি থানার ১৬টি গ্রামে ৫২৬ জন শিশু শিক্ষার্থী রয়েছে। গণউন্নয়ন প্রচেষ্টা পরিচালিত দিশারী শিশু বিদ্যালয়টি ১৯৮৫ সাল থেকে যাত্রা শুরু করে এ পর্যন্ত ২,০০০ ছাত্রছাত্রীকে প্রাথমিক শিক্ষা সম্পন্ন করার সুযোগ দিয়েছে। এই স্কুল থেকে উত্তীর্ণ অনেক ছাত্রছাত্রী পরবর্তীকালে মাধ্যমিক ও উচ্চ মাধ্যমিক পর্যায়ে কৃতিত্বপূর্ণ ফলাফল করতে সক্ষম হয়েছে। ১৯৯৬ সালে জিইউপি-এর কর্ম এলাকায় ১০০টি শিশু শিক্ষা কেন্দ্র স্থাপনের পরিকল্পনা গ্রহণ করা হয়েছে। মাদারীপুর, শরীয়তপুর, গোপালগঞ্জ এবং চট্টগ্রাম জেলার ৮টি থানায় ১৫টি ইউনিয়নের ৩২টি গ্রামে শিক্ষা কর্মসূচী সম্প্রসারিত হয়েছে। শিক্ষার্থীদের সুবিধার্থে গণউন্নয়ন প্রচেষ্টা কর্তৃক প্রস্তুত করা শিক্ষা উপকরণসমূহের মধ্যে রয়েছে 'সহজ পাতা' 'দেয়াল পত্রিকা' 'কার্টুন' এবং 'সহজ চার্ট'।

জিইউপি'র পরিভাষায় স্বাক্ষরজ্ঞান অর্জনকারী ব্যক্তি যিনি পড়তে পারেন, সাধারণ বাক্য লিখতে পারেন এবং সহজভাবে কিছু গণনা করতে পারেন তিনিই 'গ্র্যাজুয়েট'। নিরক্ষরতার অভিশাপ থেকে মুক্ত অর্থাৎ স্বাক্ষরজ্ঞানসম্পন্ন। বয়স্ক শিক্ষা কার্যক্রমের আওতায় এ পর্যন্ত প্রায় ৬৫,০০০ শিক্ষার্থী 'গ্র্যাজুয়েট' হয়েছেন। অব্যাহত শিক্ষার লক্ষ্যে প্রতি পাঁচটি শিক্ষাকেন্দ্রের পাশাপাশি স্থানে চালু করা হয়েছে একটি গ্রাম পাঠাগার। এসব পাঠাগারে বয়স্ক শিক্ষার্থীরা এসে সহজ ভাষায় লিখিত বিভিন্ন বই এবং পত্রিকা পড়ার সুযোগ পায়।

অর্থনৈতিক সঙ্কটের আবর্তে শিক্ষা

অর্থনৈতিক সঙ্কট এবং প্রাকৃতিক দুর্যোগের ঘুরপাকের ফলে অনেক দেশেই পরিকল্পিত শিক্ষা কার্যক্রম পিছিয়েছে। শিক্ষা সম্প্রসারণের জন্য অর্থনৈতিক সচ্ছলতা অপরিহার্য হলেও কোন কোন ক্ষেত্রে কৌশলগত কারণে অর্থনৈতিক দুরবস্থা সত্ত্বেও শিক্ষা সম্প্রসারণ কাজ লক্ষ্যমাত্রা অর্জন করেছে।

১৯৯১ সালে ভারতের কেরালা রাজ্যে মানুষের গড় আয় ভারতের জাতীয় গড় আয়ের চেয়ে অনেক কম ছিল। ভারতে গড় আয় ২৫০ মার্কিন ডলার হলেও কেরালা রাজ্যে গড় আয় ছিল মাত্র ২০০ ডলার, কিন্তু একই বছর পুরো ভারতে যখন নারী সাক্ষরতার হার ৩৪% তখন কেরালাতে নারী সাক্ষরতার হার ৮৭%-এ উন্নীত হয়। অর্থাৎ নারী শিক্ষা অর্থনৈতিক উন্নয়ন আনে।

বর্ধিত জনসংখ্যা

বিশ্বের বহু দেশে দ্রুত জনসংখ্যা বৃদ্ধির কারণে শিক্ষা সুবিধা প্রয়োজনের তুলনায় অপ্রতুল। নাইজিরিয়াতে ১৯৭৫-৭৬ হতে ১৯৮২-৮৩ সময়ে প্রাইমারি স্কুল বেড়েছে ৮৫% অথচ এ সময়ে স্কুলগামী শিক্ষার্থীর সংখ্যা ছিল ১৪০%। বাংলাদেশের গ্রামাঞ্চলে অনেক প্রাইমারি স্কুলে ছাত্রদের বসার জায়গা না থাকায় স্কুলের আঙ্গিনায় খোলা আকাশের নিচে ছাত্রদের পড়ানোর দৃশ্য অতি পুরনো।

বর্তমানে বাংলাদেশে মোট ৮৬,০০০ গ্রামে প্রাথমিক বিদ্যালয় রয়েছে ৫৫,০০০। ৬৪ জন ছাত্রছাত্রীর জন্য রয়েছে গড়ে একজন শিক্ষক। মোট শিক্ষকের মধ্যে প্রশিক্ষণপ্রাপ্ত শিক্ষকের সংখ্যা আরও কম। এই অবস্থায় একদিকে যেমন সর্বজনীন বাধ্যতামূলক প্রাথমিক শিক্ষার উদ্দেশ্য বাস্তবায়িত হচ্ছে না, অন্যদিকে প্রাথমিক শিক্ষার গুণগত মানও সন্তোষজনক নয়। এ অবস্থায় সরকারী উদ্যোগের পাশাপাশি দরকার বেসরসারী উদ্যোগে স্কুল স্থাপন।

নারী শিক্ষায় অগ্রযাত্রা

১৯৭০-১৯৯০ এ সময়ে বিশ্বব্যাপী নারী শিক্ষায় ব্যাপক অগ্রগতি হয়েছে। স্বল্পোন্নত দেশসমূহে এই হার ১৮% থেকে বেড়ে ৩৬%-এ উন্নীত হয়েছে। ১৯৬০-১৯৯০ এই সময়সীমায় উন্নয়নশীল বিশ্বে শিক্ষাখাতে বরাদ্দ মোট জাতীয় আয়ের ২.২% হতে বেড়ে ৩.৪%-এ উন্নীত হয়েছে। বাংলাদেশ সরকার এবং এনজিওদের যৌথ প্রচেষ্টায় বর্তমানে নারী শিক্ষায় ব্যাপক অগ্রগতি লক্ষ্য করা যাচ্ছে। বিশেষত বর্তমান সরকার কর্তৃক মাধ্যমিক স্তরের ছাত্রীদের বৃত্তিদান প্রকল্প নারী শিক্ষা বিস্তারে ইতিবাচক ভূমিকা রাখছে।

লালমনিরহাট ॥ একটি মডেল

বাংলাদেশের উত্তরাঞ্চলের জেলা লালমনিরহাট। সাক্ষরতা আন্দোলনের সফলতার একটি নতুন মডেল, নতুন উদাহরণ। সরকারী, বেসরকারী সংস্থা, স্থানীয় প্রশাসন ও শিক্ষিত তরুণ সমাজের সম্মিলিত প্রয়াসে লালমনিরহাট আজ নিরক্ষরমুক্ত। একটি সফল কাজে সবার সম্মিলিত অংশগ্রহণ কি রকম সৃষ্টি সুখের উল্লাস সৃষ্টি করতে পারে, লালমনিরহাট তার উজ্জ্বল দৃষ্টান্ত। এ দেশের বাকি ৬৩টি জেলা যদি লালমনিরহাট মডেলে এগিয়ে আসে তাহলে এই নিরন্নের দেশ, নিরক্ষরের মাটি সাক্ষরতা গর্বে গর্বিত হবে।

আসুন অন্তত একজন নিরক্ষরকে স্বাক্ষরজ্ঞান সম্পন্ন করার উদ্যোগ গ্রহণ করি। সাক্ষরতা ও শিক্ষার নতুন প্রত্যয়ে এগিয়ে যাই, নিশ্চিত করি সোনালী আগামী।